মঙ্গলকাব্য

পাঠ ও পরিক্রমা

সম্পাদনা

মানিক মৈত্র

তাপস মণ্ডল

MANGAL KABYA PATH O PARIKRAMA,
An Analysis on Mangal Kabya, by Manik Maitra and Tapash Mondal,
Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath
Majumder Street, Kolkata : 700009, March : 2021 ₹ 300.00

© লেখক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০২১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
তন্ময় ভট্টাচার্য
বরানগর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ISBN : 978-81-951540-4-3

মূল্য : তিনশো টাকা

সূ চি প ত্র

প্রথম পর্ব

রাজারাম দাসের 'নারায়ণীমঙ্গল' একটি লোকসাংস্কৃতিক অবেক্ষণ ১৫ সনৎকুমার নস্কর

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের 'বাশুলীমঙ্গল' বা বিশাল লোচনীর গীত ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'ধনপতি উপাখ্যান' : প্রসঙ্গ কবি ও কাব্য ৩৮ বিকাশ চন্দ্র পাল

দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল' ৪৯ প্রসেনজিৎ বসু

'শীতলামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব, বিশেষত্ব এবং চর্চার প্রাসঙ্গিকতা ৫৮ জগন্ময় পাত্র

ধর্মীয় আখ্যানে প্রথম ভ্রমণ কাহিনি : বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' ৬৮ শর্মিষ্ঠা পাল

'গৌরী-মঙ্গল' কাব্যের জনজীবনের নানাদিক ৭৫ দীপু হালদার

দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'কপিলামঙ্গল' : লৌকিক ও পৌরাণিক আদলে পশুপ্রীতির অপূর্ব আখ্যান ৯৮ হৃদয় রঞ্জন সরকার

'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে রামায়ণ-মহাভারত প্রসঙ্গ ১০৭ রঞ্জিতকুমার বর্মণ

কৃষ্ণরামের 'শীতলামঙ্গল' তাঁর 'রায়মঙ্গল' কাব্যের পরিশিষ্ট : একটি বিশ্লেষণী পাঠ ১১৫ বাবাই দাস

কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যের বিষয় বৈচিত্র্য ১২২ রেপা পাল

কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' : বিষয় ও আঙ্গিকের বহুমাত্রিকতা ১৩২ সুনন্দা ঘটক

মঙ্গলকাব্যের ধারায় 'কালিকামঙ্গল' : কৃষ্ণরাম দাস ও প্রাণরাম কবিবল্লভের কাব্যে বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় ১৩৯ মানিক মৈত্র

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ বৈচিত্র্য : প্রেক্ষিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য ১৫৪ তাপস মণ্ডল

দ্বিতীয় পর্ব

নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ'-এ বিষয় ও শিল্প-কাঠামোর বৈচিত্র্য	১৬৫	মঞ্জুলা বেরা
কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : নারী ও পুরুষ	১৮৩	সন্দীপকুমার মণ্ডল
মানিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ভাষা-বৈশিষ্ট্য	১৯১	সূর্য লামা
ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লাউসেন চরিত্র : একটি তুলনামূলক আলোচনা	১৯৭	ইউনুস মিঞা
বিষ্ণু পালের 'মনসামঙ্গল' : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে	২০৬	দীপঙ্কর সরকার
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় কাহিনি নির্মাণের স্বাতন্ত্র্য : প্রেক্ষিত দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'	২১৫	পিংকি বর্মণ
মুকুন্দের সৃষ্টি : মুরারিশীল ও ভাঁড়ুদত্ত	২২৩	ভুবন মণ্ডল

ধর্মীয় আখ্যানে প্রথম ভ্রমণ কাহিনি : বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'

শর্মিষ্ঠা পাল

সীমা এবং অসীমের মেলবন্ধনের অন্য নাম হিসেবে ভ্রমণকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভ্রমণপিপাসু মানুষ তার অপরিজ্ঞাত সত্যের সন্ধান লাভ করে তাকে সাহিত্যরস মণ্ডিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরলে তাই ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে পরিচয় লাভ করে। ভ্রমণ সাহিত্য একদিকে অভিজ্ঞতা আর অন্যদিকে শিক্ষারও অঙ্গ। ভ্রমণের মধ্যে যেমন সাংস্কৃতিক তথ্য থাকে, তেমনি ভৌগোলিক পরিচয়ও থাকে। যিনি ভ্রমণের বর্ণনা দিচ্ছেন তাঁর দৃষ্টিতে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রভাবে এক ধরনের বৈশিষ্ট্যও থাকে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণপিপাসু বহু সাহিত্যিকদের ভ্রমণ কাহিনি আমাদের অভিভূত করেছে একথা সত্য। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যেই নতুন নতুন পরীক্ষা করছেন তৎকালীন লেখকরা, সেসময় দাঁড়িয়ে বিজয়রাম সেন তাঁর 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যখানি রচনা করছেন এক অনন্ত ভ্রমণপিপাসু মানসিকতা নিয়ে। তবে তিনি তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আত্মতৃপ্তির পরিসরে বর্ণনা করেছেন, তা নয়। আসলে ধর্মীয় বাতাবরণে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থ ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন একজন চিকিৎসকের ভূমিকায়। সেই সূত্রে তিনি নিজের ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দু-চোখ ভরে বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য নিজের মানসপটে গ্রথিত করেছিলেন। যাত্রাপথের অতুলনীয় দৃশ্য এবং অভিজ্ঞতাকে তিনি যেভাবে বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন, তাতে তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য হিসেবেও অনন্য সম্পদ। গ্রন্থমধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে জলপথের অভিনব বর্ণনা, তেমনি ইংরেজ শাসনে তৎকালীন ভারতবর্ষের এক ভৌগোলিক মানচিত্র। বহু তীর্থস্থান সহ বাংলা-গয়া-কাশীর রাজা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আতিথ্যের নিষ্কলুষ বিবরণ। সামাজিক রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, হিন্দু-মুসলমান আপোস-মিমাংসার মতো বহু বিষয় সহ বিচিত্র স্বাদ গ্রন্থমধ্যে যত্রতত্র বিরাজমান।

মঙ্গলকাব্যের রীতি মেনে বিজয়রাম সেন কাব্যটির প্রথমে বন্দনা অংশে নারায়ণকে ত্রিভুবনসৃষ্টির কর্তা ধরে গণেশ বন্দনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গৌরী এবং কাশীর প্রধান শিবের বন্দনা করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদেশের ফলে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সহোদর গোকুলচন্দ্র সে সময়ে ইংরেজদের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে এক কাজে তিনকাজ সেরে তীর্থযাত্রা সফল করার পরামর্শ দেন। এই এক কাজে তিন কাজ কী তা আমরা গ্রন্থপাঠে জানতে পারি। **প্রথমত**—বাংলা-বিহার-কাশীর রাজনৈতিক অবস্থা। **দ্বিতীয়ত**— সামাজিক পরিকাঠামো অবহিত হওয়া। এই দুই বিষয় সংক্রান্ত তথ্য সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে শিবকে পুজো করার লক্ষ্যও কৃষ্ণচন্দ্রের সাধারণ তীর্থযাত্রাকে এক অতুলনীয় তৎকালীন সময়ের দলিলরূপে পর্যবসিত করে।

বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' প্রথম ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে ধরা হলেও এটি যেহেতু মঙ্গলকাব্য তাই পদ্যে রচিত। আর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত মূলত জলপথে নৌকাযোগে ভ্রমণ কাহিনি। তাই

'কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে' তাঁর পারিষদ বর্গেরা যাত্রার উদ্যোগ করতে থাকেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট যাত্রী নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেননি। যাত্রাপথে যার যার ভ্রমণে যেতে ইচ্ছে হয়েছে তারা এসে যোগ দিয়েছে। এইভাবে তাঁর সহযাত্রী সহস্রাধিক দাঁড়িয়েছে। যাত্রাপথে যে যে স্থানের মধ্যে দিয়ে বা যে নদীতে নৌকা তার গতিপথ বেছে নিয়েছে সেইসব জায়গার বিশেষত্ব সহ স্থাননামের গুরুত্ব বা তৎস্থানের বিশেষ ব্যক্তির পরিচয় বিজয়রাম সেন যথাযোগ্য কায়দায় উপস্থাপন করেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় যাত্রা শুরু করেছিলেন ১১৭০ সালে আর বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল' পড়ে শোনান ১১৭৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। বিজয়রাম সেন তাঁর আত্মবিবরণীতে জানিয়েছেন তিনি ভাজনঘাটের অধিবাসী, চিকিৎসা ছিল তাঁর পেশা। বংশপরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু তিনি আত্মবিবরণী অংশে লিখে যাননি। শুধু এটুকু জানা যায় কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত নোনাগঞ্জের কাছে ভাজনঘাটে তাঁর নিবাস। তবে কবির ভাইদের নাম জানা যায়, রামকিশোর, নীলকণ্ঠ ও যশোধর নামে তিনটি ভাই ছিল। ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণের পিতা এবং কন্দর্প ঘোষালের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ১৭৬৯ খ্রি: কাছাকাছি সময়ে সহস্রাধিক লোকজন নিয়ে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করেন। সে সময়ে চিকিৎসক হিসেবে বিজয়রাম সেন সেই যাত্রাপথে এসে যোগ দেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় সূত্রে বাংলার রাজনৈতিক চিত্রটিও উঠে এসেছে। এ সময়ে বাংলা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ। গভর্নর জেনারেল হ্যারি ভেরেলেস্ট, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোকুলচন্দ্রকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। গোকুলচন্দ্র বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থভ্রমণকে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চাইলেন। তার ইঙ্গিত বিজয়রাম সেন কাব্যমধ্যে দিয়েছেন—

"এক কাজে তিন কাজ করহ নৌকার সাজ
পূজ গিয়া কাশীর ঠাকুর।"[২১]

কবি বিজয়রাম কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থভ্রমণের প্রথম পর্বে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে পুটিমারীতে নৌকা উপস্থিত হলে বিজয়রাম চিকিৎসক হিসেবে যাত্রায় যোগ দেন। 'হাঁড়রা হইতে ঝিনুকঘাটা' পর্বে বিজয়রামের প্রবেশ সম্পর্কে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন—

"হেনকালে বিজয়রাম আসি কৈলা প্রণাম
বিশারদ নামেতে খেয়াতি।
তাঁর হৈল অনুমতি নৌকা চড় শীঘ্রগতি
আনন্দে নৌকাতে চড়ে তথি।।
বৈদ্য দেখি মহাশয় হইলা আনন্দময়
সবাকারে বলেন বচন।
হইল অনেক কাজ আনিলাম কবিরাজ
ব্যাধি হৈতে হইবা তারণ।।"[২২]

এরপর কবি যেভাবে স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রথম ভ্রমণ কাহিনি হিসেবে অনন্য। কাশী থেকে স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে যাত্রীদের বসন্তরোগ হলে বিশারদ মহাশয় তাদের যথাযোগ্য

চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। কবি সমস্ত কাজের জন্য আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণকীর্তন করেছেন অনেক ভণিতাংশে—

"কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কবি বিজয়রাম কয়।
বিশারদে পালন করিবা মহাশয়।।"[৭৩]

বা

"দেবীপুরে সেই দিন হইল মোকাম।
কর্ত্তার আদেশে পুথিরচে বিজয়রাম।"[৭৪]

বিজয়রাম সেন কৃত 'তীর্থমঙ্গল' মঙ্গলকাব্যাকারে লেখা একটি গ্রন্থ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণসাহিত্য যা ধর্মীয় বাতাবরণে রচিত। নদীপথে নৌকাযোগে ভ্রমণবৃত্তান্তের এক অভিনব বর্ণনার ঢঙে বিজয়রাম সেন কাব্যটিকে অনন্য করে তুলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গাতীরবর্তী বাংলা, বিহার ও কাশীপ্রদেশের সমৃদ্ধশালী জনপদসমূহের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতনামা বড়ো বড়ো লোক ছিলেন, তাদেরও সন্ধানও পাওয়া যায়। খিদিরপুর থেকে যাত্রা করে কালীঘাট, হরিপাল, খড়দহ, চাঁদপালঘাট হয়ে চিতাপুর ও বরানগরকে ডানদিকে রেখে বালীর ঘাটে নৌকা এসে পৌঁছায়। এরপর শুকচর, বেতড়, ফরসডাঙা, হুগলি হয়ে আড়পার, কুমারহট্ট, কাঁচড়াপাড়া বলাগাড়ি, পান্থাগ্রাম, গোকুলগঞ্জ, শান্তিপুর, কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি বঙ্গের গ্রাম গঞ্জের বিশেষত্ব, স্থাননামের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানের কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন কবি। তৎসহ বিহারের বহু বিখ্যাত স্থানের পরিচয়, বিশেষত্ব এবং উত্তরপ্রদেশের বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত নদীতীরবর্তী অঞ্চলকে বিজয়রাম সেন তাঁর বর্ণনাভঙ্গিমায় যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে 'তীর্থমঙ্গল' সত্যই প্রথম ভ্রমণ সাহিত্যের দাবিদার। গ্রন্থটি পদ্যে লেখা এবং এটি মঙ্গলকাব্য। একথা মেনে নিয়েও যাত্রাপথের দৃশ্যমান বহুস্থান। ঘটনার চিত্র সুন্দরভাবে একের পর এক তথ্যচিত্রের আকারে কবি কাব্যে মধ্যে তুলে ধরেছেন। তথ্যনিষ্ঠ এমনই দু চারটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। 'রাজমহলের বর্ণনা' নামক অংশে কবি বলেছেন—

"রাজমহল নগরের অপূর্ব্ব কথন।
কতশত বালাখানা আশ্চর্য রচন।।
পাঁচ ক্রোশ সহরখান ঘন ঘন ঘর।
কতো কতো মুদীখানা দেখিতে সুন্দর।।"[৭৫]

শুধু সৌন্দর্যবর্ণনা নয়, ঐতিহাসিক তথ্যকে কবি তাঁর বর্ণনা ভঙ্গির মাধুর্যে অপূর্ব মণ্ডিত করেছেন 'রামনগর-রাজদর্শন' অংশে—

"কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ ধনুর্দ্ধর।
আড়পার তাঁর বাটী শ্রীরামনগর।।
অপূর্ব রাজার বাটী অপূর্ব সৃজন।
দেখিয়া জাতেক লোক আনন্দিত মন।"[৭৬]

গয়া ভ্রমণকালে গয়া সম্পর্কে যে তথ্য কবি দিয়েছেন, তার মধ্যে দিয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থানের দিকটি ফুটে উঠেছে। শুধু শহরটির ধর্মীয় পরিমণ্ডল নয় কুৎসিত দিকটিকেও কবি দেখিয়ে দিতে পিছপা হননি—'গয়া যাত্রা' অংশে—

"পাটনা শহরের নিন্দা ছোটো ছোটো গলি।
বিষ্ঠা-মূত্রে খিচখিচী তাহে চলাচলি।"[৭৭]

এরই সঙ্গে কবি গয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে বিশেষ আকর্ষণের জায়গাটিও বাদ দেননি—

"এক দিগে ফল্গনদী গিরি তিনপাশে।
অতি উচ্চ পর্ব্বত তো উঠাছে আকাশে।।
* * * * * * *
গয়ার জতেক নারী পরমাসুন্দরী।
গজেন্দ্র গমনে চলে অতি ধীরি ধীরি।।"[৭৮]

গয়ার পিণ্ডদান সূত্রে কবি গয়ার ধর্মীয় বাতাবরণ, পুরাণের পটভূমি, মাহাত্ম্য বর্ণনা সূত্রে শ্লোকের অবতারণা করেছেন। পুরাণ কথিত গয়াসুরের আদি বৃত্তান্তও কবি দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

'কাশীগমন ও শিবস্থাপন' অংশটি কাব্যমধ্যে বিশিষ্টতার দাবিদার। রাজা বা শাসকদের রাজনৈতিক অবস্থান বা তাদের হৃদ্যতার পরিচয় এই অংশে কবি দিয়েছেন। একস্থানে কবি কোষগ্রাম নামক স্থানের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন—

"বড়োহি কুৎসিত দেশ বৃষ্টি নাহি হয়।
ইন্দিরার জলখায়্যা প্রাণ কারো রয়।।"[৭৯]

আদিগঙ্গা দর্শনের পর সেখানের মাহাত্ম্য কীর্তন, অপূর্ব বাগিচার রূপবর্ণনা, ক্রমে ক্রমে কবি আরঙ্গজেবের কবর স্থানের রূপবর্ণনা করেছেন। আসলে এখানে শেরশাহের কবরস্থান ছিল। পাণ্ডারা কীভাবে কোথায় কোথায় টাকা দাবি করে সে বিষয়টিও কবি উল্লেখ করেছেন। এইসূত্রে 'কর্মনাশার তীর'-এর কথা বলেছেন। এই নদী কাইমুর হতে নির্গত হয়েছে এবং মীর্জাপুর ও সাহাবাদ জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চৌসার নিকট গঙ্গায় পড়েছে। কবির বর্ণনা কালে এই নদী শীর্ণকায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। এই নদীর জলস্পর্শ করতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। স্পর্শ করলে সকল কর্মনাশ হয়। কিন্তু ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে, এই নদীতে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্যলাভ হয়। তবে বিজয়রাম লোকপ্রচলিত মতবাদের প্রচারই লক্ষ করেছেন যাত্রীগণের মধ্যে। তাই দেখা যায়—

"কেহ এক কেহ দুই তিন পৈশা দিয়া।
কন্ধেতে হইলা পার হৃষ্টচিত্ত হয়্যা।।
জনম অবধি জত কর্য্যা থাকে ধর্ম্ম।
কর্ম্মনাশার জলস্পর্শে নষ্ট হয় কর্ম্ম।।"[৮০]

এইভাবেই কবি 'কাশীর বিবরণ', 'প্রয়াগযাত্রা', 'প্রয়াগতীর্থ', বিবরণ অংশে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের দয়া-দাক্ষিণ্যের রূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি যে কতটা বিচক্ষণতার সঙ্গে সহস্র যাত্রীকে তাঁর তীর্থযাত্রায় সামিল করেছেন তা আমরা অবিদিত হতে পারি তার স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীর বর্ণনায়।

ভ্রমণ কাহিনিতে সচরাচর ব্যক্তি প্রভাব থাকে না। কিন্তু 'তীর্থমঙ্গল' ধর্মীয় বাতাবরণে লেখা। আর এক কাজে তিন কাজ করার উদ্দেশ্য অনেকটা প্রভাবিত করেছে কাব্যকে। তাই দেখা যায় যাত্রাপথে বহু বিদ্বৎজনের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মহাশয় সাক্ষাৎ করেছেন যেহেতু রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার পরিচয় সংগ্রহ তাঁর আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য ছিল। তাই সহযাত্রীগণ তাঁর তীর্থযাত্রার সঙ্গী হয়েছে অবলীলায় এবং তিনি সাদরে আমন্ত্রণও করেছেন। গঙ্গাতীরবর্তী বাংলা, কাশী-গয়া-বিহারের বহু জনপদের সমৃদ্ধশালী লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশের অবস্থান ও প্রকৃতি জানার চেষ্টা মহারাজা করেছেন। এই সূত্রে যে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন তাঁরা হলেন কলিকাতার বনমালী সরকারের ঘাটে রঘুনাথ মিত্র ও রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর, হুগলিতে দেওয়ান রাজকিশোর রায়, রাজমহলের ফৌজদার, সূর্যগড়ায় শঙ্কর মজুমদার, বাড়ে রামানন্দ সরকার, পাটনার ভায়া বিষ্ণুসিংহ রায়, রাজা সেতাব রায় ও দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ, টিকারীতে দেওয়ান মাধবরাম, প্রয়াগে দুলাল চাটুয্যে, কাশীর আড়পারে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ এবং প্রত্যাগমন কালে গোটাপাড়ায় কালুরায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। উক্তব্যক্তিদের সঙ্গে সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপন করার পর নানা উপঢৌকন দিয়ে তাদের উক্ত ব্যক্তিদের প্রজাবর্গকেও বিচক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ আচরণের দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন।

কাব্য থেকে কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে জানা যায়, তিনি তীর্থ করতে গিয়ে শুধু পুণ্য অর্জন করে ফিরে আসতে চাননি। যেখানে যা কিছু ভালো দেখেছেন তা দু-চোখ ভরে অবলোকন করেছেন। শাস্ত্রানুসারে তীর্থভ্রমণ এবং কৃত্যকর্মের পরে বিত্তশালী রাজার ন্যায় মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করেছেন যার প্রমাণ "কাশী আগমন ও শিবস্থাপন" অংশে রয়েছে। 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যর পাঠোদ্ধারকালে এ বিষয়ে অবগত হওয়া যায় যে, কৃষ্ণচন্দ্র পিতা কন্দর্প ঘোষালের নামানুসারে 'কন্দর্পেশ্বর'-এ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, এখনো তা পূজনীয়। খিদিরপুর থেকে যাত্রা এবং প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত যে স্থানের মধ্যে দিয়ে তিনি যাত্রা করেছেন, সেসব জায়গায় দ্রষ্টব্য স্থান ও দর্শনীয়বস্তু আছে তা বিশেষ করে দেখে মর্ম উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন এবং বিজয়রাম সেন তাঁর লেখনী কৌশলে সেইসব বিষয়কে অতীব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তৎসহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান এবং সেই স্থানের গুরুত্ব, দেশের অবস্থা, বাঙালি-বিহারি সংস্কৃতির রূপ, ইংরেজ শাসনের রাজনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ বলা যায় সামাজিক চিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ এক ভ্রমণপিপাসু মানসিকতার সঙ্গে কবি বিজয়রাম সেন উপস্থাপন করেছেন কাব্যমধ্যে।

'তেলিয়াগড়ী হইতে মুর্শিদাবাদ' নামক অংশে বাংলায় ফিরে আসার যাত্রাপথের বর্ণনা শুরু। খিদিরপুর থেকে যাত্রাকালে বাংলার বিশেষ বিশেষ স্থানের যতটা না বর্ণনা পাওয়া যায় অনেক বেশি পাওয়া যায় এই অংশ থেকে। নদীয়া নগরের বর্ণনা বিজয়রাম সেনের লেখনীতে অপূর্বমণ্ডিত হয়েছে—

"নবদ্বীপ আইলা নৌকা বায়্যা ত্বরাত্বরি।
ঘাটে ঘাটে স্নান করে নবদ্বীপের নারী।।
অপূর্ব সুন্দর সব নদ্যার রমনী।
দেখিতে দেখিতে মাজী বাহিল তরনী।।

শতেরো শত ব্রাহ্মণ আছে নদ্যার ভিতরে।
আর কত কত লোককে বলিতে পারে।।"[৭১১]

'নদীয়া হইতে খিদিরপুর' অংশের বর্ণনায় কবি 'শান্তিপুর' গ্রামের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন এই গ্রামের সমান কোনো গ্রাম নেই বঙ্গে। কারণ হয়তো মহাপ্রভু। কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্বে গৌড়শ্বরের রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশধরগণ এখানে বসবাস করায় জনে জনে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। এই বংশেই সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর জন্ম। অদ্যাপি শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বংশধরগণ বাস করেছেন। তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নিকট পুণ্যস্থান বলে পরিচিত। তৎপরবর্তীতে কবি বিজয়রাম কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে সেখানের বর্ণনা দিতে অপারগ, সে সূত্রে উক্তিটি উল্লেখযোগ্য—

"বরানগর চিতপুর কলকাতা সহর।
বামেতে রাখিয়া নৌকা চলিলা সত্বর।।
কলিকাতার অপূর্ব সৃষ্টি দেখ্যা বিশরদ।
রচিতে না পার্য্যা বলে কি হৈল আপদ।"[৭১২]

এই পর্বেই সমাপ্তি। গ্রন্থ শেষ করার কালে কবি বিজয়রাম কৃষ্ণচন্দ্রের গুণকীর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে পুণ্যকর্ম করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সহস্রজনকে গয়া-কাশী দর্শন করিয়ে যে মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন তা কজন ব্যক্তি পারেন, তাই কবি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেন—

"শিবশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ যেন বিজয়রাম।
কেবল থাকিলা দুঁহে ভাব্যা পরিণাম।।
কৃষ্ণচন্দ্র কাশীনাথের হয়্যা গেল দয়া।।
এই হেতু সবাকার হয়্যা গেল গয়া।
গয়া আদি তিন তীর্থ হৈল সবাকারে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম কোন জনে করে।।"[৭১৩]

কবি বিজয়রাম সেন হয়তো কালীমাতার ভক্ত ছিলেন। কারণ তিনি গ্রন্থশেষে কালীমাতার স্মরণ করে কৃষ্ণচন্দ্রের উপর তার কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করার কথা বলেছেন। তৎসহ তিনি দেওয়ান গোকুলচন্দ্রেরও গুণকীর্তন করেছেন। তিনি যে বিখ্যাত দাতা হিসাবে বঙ্গদেশে পরিচিত একথা তিনি সমাদরে ব্যাখ্যা করেছেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রদের উপরও প্রভুর কৃপা বজায় রাখতে অনুরোধ করেন বা প্রার্থনা করেন। কাব্যটি ভাদ্রপদ মাসে সাত্তাত্তর সনে শেষ হয়েছে এমনটা তিনি সমাপ্তিকালে পুষ্পিকাংশে উল্লেখ করে ভণিতার মধ্যে দিয়ে শেষ করেছেন।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ধারাবাহিকতা উনবিংশ শতাব্দী থেকে লক্ষ করা যায়। কিন্তু উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় বাতাবরণে কবি বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' দিয়ে। প্রাক্ উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হলেও কাব্যটির রচনা নৈপুণ্য এবং বর্ণনাভঙ্গি আধুনিক ভ্রমণ কাহিনির থেকে কোনো অংশেই কম নয়। শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যটুকু বাদ দিলে গ্রন্থটির সাহিত্যরস ভ্রমণসাহিত্যের দিক থেকে বিচারযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক,

সাংস্কৃতিক আবহ যা বাংলার সঙ্গে জড়িত সেইসব বিষয়ের এক অনন্য দলিল বলা যেতে পারে এই কাব্যকে। শুধু তাই নয়, শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যেরও নিদর্শন এই কাব্যে উঠে এসেছে। শুধু তীর্থভ্রমণ যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয় তা কাব্যপাঠে অবগত হওয়া যায়। তাই নিছক তীর্থভ্রমণ নয়, কাব্যটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের রূপোন্মোচনেও যে এক অনবদ্য সম্পদ একথা স্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

১. বিজয়রাম সেন— 'তীর্থ-মঙ্গল', পরশপাথর প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ-১৯১৬, পরশপাথর সংস্করণ-২০০৯, ৯১/১ বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০০০৯। পৃষ্ঠা নং-৩২।
২. ঐ। পৃ: ৪৩।
৩. ঐ। পৃ: ৬৪।
৪. ঐ। পৃ:৫৮।
৫. ঐ। পৃ: ৫০।
৬. ঐ। পৃ: ৯৭।
৭. ঐ। পৃ: ৬০।
৮. ঐ। পৃ: ৬৪।
৯. ঐ। পৃ: ৭৩।
১০. ঐ। পৃ: ৭৫।
১১. ঐ। পৃ: ১১৮।
১২. ঐ। পৃ: ১২২।
১৩. ঐ। পৃ: ১২৪।